দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 05 OCT 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

৫৩

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ॥ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

সারা বিশ্বের সাথে সঙ্গতি রেখে আজ ৫ অক্টোবর বাংলাদেশে উদযাপিত হচ্ছে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস'। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিবেচনা করে এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশন ও শিক্ষক সমিতিসমূহের যৌথ উদ্যোগে এই দিনটি পালিত হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে। বাংলাদেশে শিক্ষকদের সৌভাগ্যই বলতে হবে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে এই দিবসের উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। তবে বন্যার কারণে তিনি ৫ তারিখের পরিবর্তে ৯ অক্টোবর ওসমানী মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করবেন, যদিও বাংলাদেশসহ বিশ্বের শিক্ষকসমাজ যথারীতি ৫ অক্টোবর দিনটি পালন করছে।

ইউনেস্কোর ছাব্বিশতম সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী এই দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৫ অক্টোবর তারিখ বেছে নেয়া হয় এই কারণে যে, ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিশেষ সম্মেলনে শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত ইউনেস্কো-আইএলও সুপারিশমালা গৃহীত হয়"। বাংলাদেশে এবার প্রথমবারের মতো জাতীয়ভাবে এবং সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়ে এই দিবসটি উদযাপিত হলেও গতবছর ১৯৯৪ থেকে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালন শুরু হয়। গত বছরেও বাংলাদেশে এই দিনটি পালিত হয় বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের উদ্যোগে, তবে বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশন ও বাংলাদেশ সরকারের তাতে কোন ভূমিকা ছিল না। ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিশেষ সম্মেলনে শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত ইউনেস্কো-আইএলও সুপারিশমালা গৃহীত হওয়া একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এই জন্য যে, শিক্ষকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটা প্রথম আন্তর্জাতিক ঘোষণা-যা বিশ্বব্যাপী শিক্ষকদের ন্যায়ানুগ ও যুক্তিপূর্ণ প্রত্যাশাসমূহের পরিপূরণে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে আসছে। কার্যত এই ঘোষণা সুদীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অনুষ্ঠিত আলোচনা, সভা এবং বিশ্বব্যাপী শিক্ষক সম্প্রদায় ও সরকারসমূহের মধ্যে পরামর্শমূলক সমঝোতার ফলশ্রুতি। ১৯৬৪ সাল থেকে এর শুরু, যখন ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে চীনা প্রতিনিধি এই মর্মে অনুরোধ করেন যে, বিশ্বের শিক্ষকদের জন্য একটি সনদপত্র রচিত হওয়া প্রয়োজন যেখানে– (ক) শিক্ষকদের অধিকারসমূহ নিশ্চিত হবে, (খ) তাঁদের নৈতিক অবস্থান দৃঢ়তর হবে এবং (গ) শিক্ষাদানক্ষেত্রে তাঁদের স্বাধীনতা সংরক্ষিত থাকবে। ১৯৪৭ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত দশম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রাথমিক মতবিনিময়ের পর এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "একটি সম্মত সনদপত্রের মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশাকে যথাযথ গুরুত্ববহ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।"

ঘটনাপঞ্জির ধারাবাহিকতায় এভাবেই অর্জিত হয় ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর উল্লিখিত সুপারিশমালা। যা-ই হোক ১৪৫টি অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত শিক্ষক ও শিক্ষা সম্পর্কিত এই সুপারিশমালায় শিক্ষা ও শিক্ষক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির মধ্যে বলা হয়েছে যে, (ক) শিক্ষা যেহেতু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিয়োজিত সেহেতু একে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, (খ) শিক্ষক সংগঠনগুলোকে সহায়ক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। কারণ শিক্ষা প্রসার ও শিক্ষার অগ্রগতি সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সেই জন্য শিক্ষক সংগঠনসমূহকে শিক্ষার নীতি নির্ধারণে সম্পৃক্ত রাখা উচিত, (গ) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক মত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল নাগরিকের শিক্ষার সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে হবে, (ঘ) শিক্ষকদের নিয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে কোনপ্রকার বৈষম্য বাঞ্ছনীয় নয়, (ঙ) শিক্ষক সংগঠনের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে তাঁদের বেতনস্কেল নির্ধারণ কতে হবে এবং এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে বিভিন্ন পর্যায়ে বা স্তরে শিক্ষকদের মধ্যে কোনরূপ বিভেদ সৃষ্টি না হয়, (চ) শিক্ষক সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 'কর্তৃপক্ষ' নির্ধারিত থাকতে হবে, (ছ) 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' শিক্ষক সংগঠনসমূহের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে তাঁদের পেশাগত দায়দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করবে এবং নিয়োগসংক্রান্ত নীতিমালায় শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি তাঁদের অধিকারও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে ইত্যাদি।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সংক্রান্ত ইউনেস্কো-আইএলও সুপারিশমালায় শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী তথা দেশ, জাতি ও সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শিক্ষকতা পেশার গুরুত্ব, শিক্ষকসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য, তাঁদের পেশাগত সুযোগ-সুবিধা, অবসরকালীন সময়ে আর্থিক নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা বা আপতকালীন অবস্থায় সহায়তা ইত্যাদি প্রায় সকল বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই সুপারিশমালার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাস্তব চিত্র কিঃ পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে; বাংলাদেশের বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে শতকরা ৯০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রী, শতকরা দশ ভাগেরও কম সরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায়। কিন্তু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় রাজস্ব খাতে সরকারী ব্যয় মাত্র ১০ ভাগের ১ ভাগ এবং উন্নয়ন খাতে ১০০ ভাগের ১ ভাগেরও কম। সরকারী স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী প্রতি যেখানে সরকারের বার্ষিক ব্যয় ৩ হাজার ৪১১ টাকা সেখানে বেসরকারী স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী প্রতি গড়ে বার্ষিক ব্যয় ৯০৫ টাকা মাত্র। বেসরকারী শিক্ষকদের কোন উৎসবভাতা নেই। বাড়ি ভাড়া পিয়ন থেকে প্রিন্সিপাল পর্যন্ত এক শ' টাকা। এই চিত্র স্বভাবতই চমকে দেয়ার মতো। অথচ গণতন্ত্রের নীতিমালা মানতে হলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সন্তানরা যেখানে লেখাপড়া করে জনসংখ্যা অনুপাতে সেখানে অথবা অন্যত্র রাজস্ব উন্নয়ন খাতে সরকারের ব্যয় বরাদ্দ হওয়া উচিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮(১) এবং ১১ অনুচ্ছেদ অনুসারেও এর বাইরে কিছু বলার অবকাশ নেই। একথা সত্য যে, শিক্ষা জাতির উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য এবং দক্ষ, মেধাবী ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ব্যতিরেকে প্রত্যাশিত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেই জন্য প্রয়োজন শিক্ষা তথা শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষকদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন। জাতীয় ঐতিহ্য ও প্রয়োজনের নিরিখে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি জাতীয় শিক্ষানীতির অনুসরণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই হোক তাই এবারের বিশ্ব শিক্ষক দিবসে বাংলাদেশের শিক্ষকসমাজ ও শিক্ষানুরাগী জনগণের প্রত্যাশা। তাই বিশ্বব্যাপী শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন "এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল" ১৯৯৫-এর বিশ্ব শিক্ষক দিবসে যেখানে ধ্বনি তুলেছে ঃ "শিক্ষকসমাজ শিক্ষা প্রক্রিয়ার অন্তঃস্থলে" সেখানে বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজের এবারের ধ্বনি "শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের তথা শিক্ষা উন্নয়নের নতুন ধারায় আন্দোলন"।